প্যারামেডিক/কাউন্সেলর, স্বাস্থ্য সহকারী/স্বাস্থ্যকর্মী/সিএইচসিপি এনজিও স্বাস্থ্যকর্মী ও গ্রাম ডাক্তারদের জন্য যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ (ইনফেকশন কন্ট্রোল) সম্পর্কিত নির্দেশিকা

(১ম সংস্করণ, নভেম্বর-২০১৩)

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

c¨vi‡gwWK/KvD‡Ýji, ¯v¯¨ mnKvix/¯v¯¨Kgx/wmGBPwmwc GbwRI ¯v¯¨Kgx I Mvg Wv³vi‡`i Rb¨ h²v msµ gY wbqšY (Bb‡dKkb K‡›Uvj) m¤úwKZ wb‡`wkKv

(1g ms¯‹iY, b‡f¤i-2013)

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

RvZxq h²v wbqšY KgmwP
¯v¯¨ Awa`ßi
¯v¯¨ I cwievi Kj¨vY gšYvjq

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

Printed by
Real Printing and Advertising
K.R Plaza, 31 Purana Paltan
Dhaka-1000, Bangladesh

সূচিপত্র

১.	ভূমিকা	৫
২.	জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি	৫
৩.	যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ:	৫
৪.	যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬
৫.	যেভাবে যক্ষ্মা ছড়ায়	৬
৬.	যক্ষ্মা সংক্রমণ এবং রোগের হার	৭
৭.	যক্ষ্মা সংক্রমণের সম্ভাব্য কারণ সমূহ	১০
৮.	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে যক্ষ্মা সংক্রমণের ঝুঁকি	১০
৯.	স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্মীদের ঝুঁকিসমূহ	১১
১০.	সংক্রমণ ক্ষমতা	১১
১১.	যক্ষ্মা রোগ সংক্রমণ কমানোর পদক্ষেপসমূহ	১১
১২.	দ্রুত যক্ষ্মা রোগ সনাক্ত করা	১১
১৩.	জীবাণু ছড়ানো নিয়ন্ত্রণ	১২
১৪.	স্বাস্থ্য কর্মীদের যক্ষ্মা প্রতিরোধ ও সেবা সমুহ	১২
১৫.	সঠিক বায়ু চলাচল নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করা	১২
১৬.	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি	১৩
১৭.	আবদ্ধ জনবহুল স্থাপনায় যক্ষ্মার ঝুঁকি	১৩
১৮.	বাসস্থান	১৩
১৯.	যক্ষ্মারোগ সনাক্তকরণের পূর্বে ও পরে বাসস্থানে যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের উপায়	১৪
২০.	হাঁচি-কাশির আচরণবিধি	১৪
২১.	ভাল এবং মন্দ অভ্যাসের উদাহরণ (বাংলাদেশ)	১৬
২২.	ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য ও স্বাস্থ্যকর্মীদের করণীয়সমূহ	১৭
২৩.	যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ১০টি পদক্ষেপ	১৭
২৪.	নির্দেশিকাটি তৈরিতে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন	১৮

ভূমিকা

যক্ষ্মা একটি সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক আক্রান্ত হয় এবং দ্রুত রোগ নির্ণয় করে সঠিক চিকিৎসা না দিলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে যক্ষ্মাকে একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে প্রতিকার ও প্রতিরোধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাইকোব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ কন্ট্রোল (এমবিডিসি) এর আওতাধীন জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। DOTS পদ্ধতির মাধ্যমে ১৯৯৩ সনে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরম্ভ করার পর থেকে বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। তার পরেও দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যক্ষ্মা রোগী আছে বলে ধারনা করা হয় ।

বাংলাদেশে প্রতি বছর ৩ লাখের বেশি লোক নতুন ভাবে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয় এবং যক্ষ্মার কারণে প্রায় ৬৮ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। যক্ষ্মা রোগকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা (কফে জীবাণুযুক্ত রোগী নির্ণয়ের হার ৭০% এবং চিকিৎসা সাফল্যের হার ৮৫%) অর্জিত হয়েছে। এতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কার্যকরভাবে যক্ষ্মা রোগের বিস্তার রোধ ও নিয়ন্ত্রণ কল্পে সমাজে বিদ্যমান যক্ষ্মা রোগীদের সময়মত সনাক্ত করে পূর্ণ মেয়াদে সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা অতীব জরুরি ।

যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি বাংলাদেশে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তাই প্যারামেডিক / কাউন্সেলর/ স্বাস্থ্য সহকারী/স্বাস্থ্যকর্মী/ সিএইচসিপি/এনজিও কর্মী ও গ্রাম ডাক্তারদের যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি অতীব জরুরি বিবেচনা করে এই নির্দেশিকাটি রচিত হয়েছে ।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৩ সালে নভেম্বর মাসে প্রথমে দুটি জেলার চারটি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে DOTS পদ্ধতিতে কর্মসূচি শুরু হয়। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে দেশের সকল উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনে এই কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সকল জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, মেট্রোপলিটন এলাকা, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সদর হাসপাতাল, পুলিশ ও মিলিটারী হাসপাতাল, কারাগার এবং কর্মস্থলে (গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী/কল কারখানায়) বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিনামূল্যে যক্ষা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়।

যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ:

যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে যক্ষ্মার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

যেহেতু ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা (DR TB) এবং টিবি-এইচআইভি সহ-সংক্রমণ যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের জন্য বড় ধরনের অন্তরায়, তাই যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ।

বাংলাদেশে সব (নতুন-পুরাতন) ধরনের যক্ষ্মার ব্যাপকতার হার (Prevalance rate) প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ৪১১ । তবে নতুন ভাবে রোগে আক্রান্তের হার প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ২২৫। যদিও বাংলাদেশে ঔষধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মার হার তুলনামূলক কম, তবে উচ্চ যক্ষ্মা অধ্যুষিত দেশ হিসেবে প্রকৃত সংখ্যা প্রায় চার হাজারের মত।

স্বাস্থ্যকর্মীরা, যক্ষ্মা সংক্রমণ ও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্তের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, যেখানে অনির্ণীত ফুসফুসে যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীরা হাঁচিকাশি দিচ্ছে, সেখানে চিকিৎসাকর্মী ব্যতিত অন্যান্য কর্মী ও দর্শনার্থিরাও সেসব রোগীদের সংস্পর্শে এসে যক্ষ্মার ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। যেখানে মানুষের ভীড় বেশি ও অপ্রতুল বায়ূপ্রবাহ, সেখানে যক্ষ্মা সংক্রমণের আশংকা বেশি। রোগীদের অপেক্ষার স্থানসমূহ, বারান্দা, পরীক্ষাগার- (TB laboratory) সংক্রমণের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ।

তাই ডটস সেন্টার, বক্ষব্যাধি ক্লিনিক ও হাসপাতাল, ঔষধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মার চিকিৎসাস্থল এবং পরীক্ষাগারে যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে ।

যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে– স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, আবাসস্থল ও জনসমাগম স্থলে যক্ষ্মার জীবাণু ছড়ানো হ্রাসের চেষ্টা করা । এছাড়াও, অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো হল–

১. যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার সকল পদ্ধতি সমূহের সার্বিক সমন্বয় জোরদার করণ।

২. যত্রতত্র কাশি দেওয়া ও থুথু ফেলা থেকে বিরত করা বা থাকা।

৩. সংক্রমিত পদার্থ/বস্তু সমূহ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও আবাসস্থল থেকে সরিয়ে ফেলা।

৪. নিঃশ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে জীবাণুর অনুপ্রবেশ কমানো।

যেভাবে যক্ষ্মা ছড়ায়

যক্ষ্মা রোগীর হাঁচি-কাশির মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু বের হয়ে বাতাসে মিশে এবং তা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির ফুসফুসে ঢুকে সংক্রমণ ঘটায়।

একজন সুস্থ মানুষ সংক্রমিত হওয়ার পরে দুই থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে সাধারনত যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ সমূহ দেখা দিতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জীবাণু অনেক বছর পর্যন্ত শরীরের অভ্যন্তরে সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে এবং এ সময় তারা রোগ ছড়ায় না ।

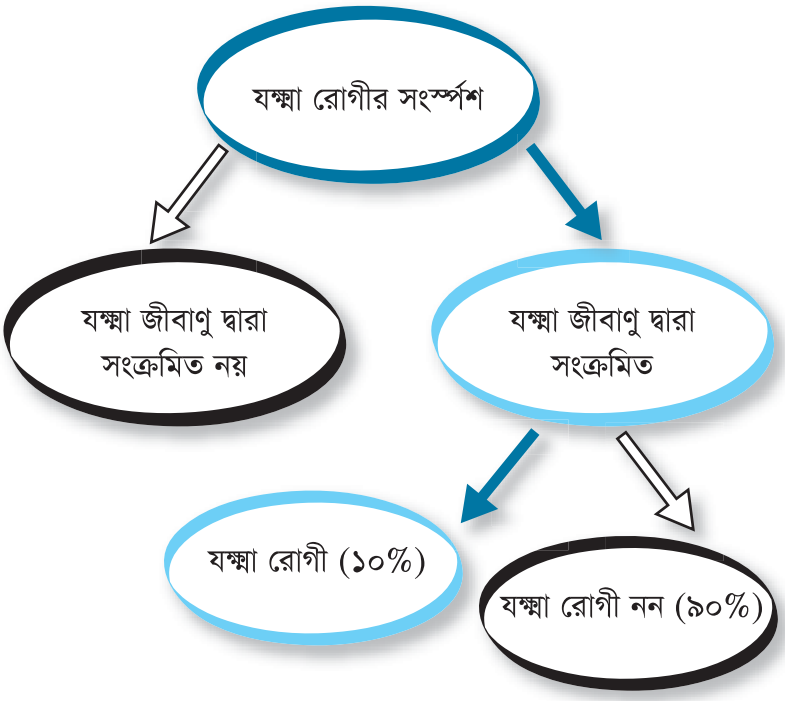

চিত্র ০১ : যক্ষ্মা সংক্রমণ এবং রোগের হার

চিত্র ০২ : একজন যক্ষ্মা রোগী থেকে যেভাবে অন্যদের মাঝে যক্ষ্মা ছড়ায়

চিত্র ০৩ : যক্ষ্মা রোগীর নিকট সংস্পর্শে থাকা পরিবারের সদস্যদের যেভাবে সংক্রমণের অধিক ঝুঁকি থাকে

যক্ষ্মা সংক্রমণ ও যক্ষ্মা রোগ (TB Infection and TB Disease)

যক্ষ্মা জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত ব্যক্তি ও যক্ষ্মা রোগীর মাঝে নিম্নোক্ত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়:

যক্ষ্মা জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত ব্যক্তি (TB Infection)	যক্ষ্মা রোগী (TB Disease)
দেহে জীবাণু বংশ বৃদ্ধি করে না	দেহে জীবাণু বংশ বৃদ্ধি করে
সাধারণতঃ সুস্থ	সাধারণতঃ অসুস্থ
এক্স-রে স্বাভাবিক	এক্স-রে স্বাভাবিক নয়
কফ জীবাণুমুক্ত	কফ জীবাণুযুক্ত হতে পারে
এমটি টেস্ট পজিটিভ	এমটি টেস্ট পজিটিভ
অন্যকে সংক্রমিত করে না	অন্যকে সংক্রমিত করে
যক্ষ্মা রোগী নন	যক্ষ্মা রোগী

টেবিল ১ : যক্ষ্মা সংক্রমণ ও যক্ষ্মা রোগের মাঝে পার্থক্য

যক্ষ্মা সংক্রমণের সম্ভাব্য কারণ সমূহ

১। জীবাণু সম্পর্কিত কারণ সমূহ

- রোগীর হাঁচি কাশির মাধ্যমে ছড়ানো জীবাণুর সংখ্যা/পরিমাণ/ঘনত্ব।
- যক্ষ্মা জীবাণুর ক্ষতিকারক ক্ষমতা।
- জীবাণুর সান্নিধ্য-জীবাণুর সংস্পর্শে থাকার সময়কাল যত বেশি হবে সংক্রমণের ঝুঁকিও তত বেশি। এছাড়া জীবাণুর উপস্থিতি যত নিকটে হয় ঝুঁকিও তত বেশি হয়।

২। যে সকল কারণে সংক্রমিত ব্যক্তি যক্ষ্মা রোগী হতে পারেন- (ব্যক্তি সম্পর্কিত কারণ)

- শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে, যেমন-দীর্ঘ মেয়াদী রোগে (ক্রনিক ডিজিজ) ভুগছেন এমন রোগী, পুষ্টিহীনতা, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি ইত্যাদি।
- এইচ আই ভি আক্রান্ত ব্যক্তি। এইচ আই ভি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস বা নষ্ট করে দেয়।
- শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল করে এমন ধরনের ঔষধ, যেমন-প্রেডনিসোলন, ডেক্সামেথাসোন, হাইড্রোকর্টিসোন,ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ (কেমোথেরাপি)।
- এছাড়া যাঁরা ধূমপান করেন বা মাদকাসক্ত তাদেরও যক্ষ্মা হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি।

৩। পরিবেশগত কারণসমুহ

- আবদ্ধ ও জনবহুল স্থান।
- অপর্যাপ্ত বায়ু চলাচল। উল্লেখ্য যে বাতাস জীবাণুকে দ্রুত আবদ্ধ জায়গা থেকে বাইরে বের করে দেয়। এতে রোগের ঝুঁকি কমে যায়।

যে সকল কারণে যক্ষ্মা রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়

- ফুসফুস ও শ্বাসনালীতে আক্রান্ত যক্ষ্মা রোগীর উপস্থিতি।
- কফে জীবাণুযুক্ত যক্ষ্মা রোগীর উপস্থিতি।
- নাক মুখ না ঢেকে হাঁচি-কাশি দেওয়া।
- যথাযথ ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা গ্রহণ করেন নাই এমন রোগীর উপস্থিতি।

স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে যক্ষ্মা সংক্রমণের ঝুঁকি

স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে যক্ষ্মার জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি আছে। এই সংক্রমণ নিম্নোক্তদের মাঝে হতে পারে-

- রোগী (যক্ষারোগে আক্রান্ত নন, অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত)
- দর্শণার্থী/ভিজিটর অথবা রোগীর সাথে আগত পরিবার পরিজন।
- স্বাস্থ্যকর্মী-
  - স্বাস্থ্যসেবাদানকারী কর্মী, যেমন- ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক, DOT সেবাপ্রদানকারী।
  - ল্যাবরেটরী কাজে নিয়োজিত কর্মী বিশেষত যারা কফ সংগ্রহ, Smearing, Culture and DST ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িত।
- স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কর্মরত বর্জ্য/পয়ঃ নিষ্কাশন কর্মী, যেমন-ক্লিনার, পরিচ্ছন্নতা-কর্মী।
- সংক্রমণক্ষম যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শে আসা যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ।

স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্মীদের ঝুঁকি সমূহ

- যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় ও ব্যাবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ।
- কাশি উৎপাদন হতে পারে এমন প্রক্রিয়া যেমন Sputum induction, Intubation, Bronchoscopy ইত্যাদি।
- সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাবস্থা একেবারে নেই অথবা থাকলেও সীমিত আকারে আছে এমন কর্ম-পরিবেশ।
- কফে জীবাণুযুক্ত অথবা Culture positive রোগীর সংস্পর্শে বার বার আসা।
- রোগীর সংস্পর্শে বা নিকট সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন ধরে থাকা।
- কফে জীবাণুযুক্ত এবং/অথবা Culture positive রোগী যারা এখনো চিকিৎসা শুরু করেনি, তাদের সংস্পর্শে আসা।
- স্বাস্থ্যকর্মীদের এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত হওয়া অথবা কোন কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া।

সংক্রমণ ক্ষমতা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ফুসফুসে যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীর পরপর দুটি কফ পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ না হয় (এর মাঝে অন্ততঃ একটি সকালের নমুনা), ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সংক্রমণক্ষম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

DR TB বা ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা সাধারণত চিকিৎসায় কিছুটা দেরীতে সাড়া দেয় এবং কফ বা Culture পরীক্ষা অনেক দিন পর্যন্ত পজিটিভ থাকতে পারে। ফলে এ সকল রোগীদের থেকে তাদের নিকট সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিদের মাঝে দীর্ঘদিন যাবৎ সংক্রমণ হতে থাকে।

রোগ সনাক্ত করা বা চিকিৎসা শুরু করার পূর্বে যক্ষ্মা রোগীদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের যে সব স্থানে সেবা প্রদান করা হয় (যেমন অপেক্ষাগার, ল্যাবরেটরি, বহিঃবিভাগ, টিকেট কাউন্টার) সে সব স্থানেও সংক্রমণের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশি। এ ছাড়া কফ উৎপাদন করে এমন পরীক্ষা-নীরিক্ষা বা চিকিৎসা প্রক্রিয়াতেও এ ঝুঁকি বাড়তে পারে।

যক্ষ্মা রোগ সংক্রমণ কমানোর পদক্ষেপসমূহ

যক্ষ্মার লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকে দ্রুত সনাক্ত করা

- কাশির ইতিহাস জেনে যক্ষ্মা রোগীকে সনাক্তকরনের জন্য একজনকে দায়িত্ব প্রদান করা।
- সন্দেহ জনক যক্ষ্মা রোগী এবং সংক্রামক যক্ষ্মা রোগীকে আলাদা করা।
- কাশিযুক্ত রোগীকে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলকারী কক্ষে আলাদা করা।
- কফে জীবাণুযুক্ত যক্ষ্মা রোগী ও ঔষধ প্রতিরোধী (এম ডি আর/এক্স ডি আর) যক্ষ্মা রোগীদের সনাক্তকরা ও পৃথকভাবে রাখা।
- যক্ষ্মা রোগীদের আলাদা করার যৌক্তিকতা রোগী এবং দর্শনার্থীদেরও বুঝিয়ে বলা।

দ্রুত যক্ষ্মা রোগ সনাক্ত করা

- দ্রুত রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি ও সেবা সমূহকে আরো উন্নত করা।
- রোগী ভর্তি ও অপেক্ষার সময়ের মানদন্ড ও বৈশিষ্ট্য সমূহ তৈরী করা ও পর্যালোচনা করা।
- অপেক্ষার সময় ও চিকিৎসকের সাথে পরামর্শের সময় যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করা।

জীবাণু ছড়ানো নিয়ন্ত্রণ

- কাশি দেয়ার নিয়ম (কফ এটিকেট) সম্বলিত বার্তা ও তথ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ (আই.ই.সি) উপকরণ সমুহ বিতরন।
- ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীদেরকে মাস্ক বা মুখোশ সরবরাহ করা এবং এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- সেবা কেন্দ্রের শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত স্বাস্থ্য নীতি (Respiratory hygiene) মেনে চলার জন্য। রোগীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং বুঝিয়ে রাজি করানো।
- মাস্ক ব্যবহারকারীকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন না করা।

স্বাস্থ্য কর্মীদের যক্ষ্মা প্রতিরোধ ও সেবা সমুহ

- স্বাস্থ্যকর্মীদের যক্ষ্মার লক্ষণ সমূহের যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে এবং লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাৎক্ষনিক সেবা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যকর্মীদের বাৎসরিক ভিত্তিতে যক্ষ্মা নির্ণয়ের পরীক্ষা করতে হবে।

সঠিক বায়ু চলাচল নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করা

- আড়াআড়ি বায়ু নিষ্কাশন ও প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ার্ডের দরজা ও জানালা বিপরীত মুখে স্থাপন করা।
- সর্বোচ্চ আড়াআড়ি বায়ু প্রবাহের জন্য বিপরীতমুখী দরজা-জানালা খোলা রাখা।
- আবদ্ধ কক্ষে, যেখানে গোপনীয়তার কারনে দরজা খোলা যায় না সেখানে বায়ু প্রবাহের জন্য প্রবেশ দ্বারে অথবা উপরে খোলা রাখার ব্যবস্থা করা।
- যেখানে প্রাকৃতিক বায়ু প্রবাহ পর্যাপ্ত নয় সেখানে অতিরিক্ত বায়ু প্রবাহের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহার করা।

চিত্র ৪ : বসার আসন - চিকিৎসকের কক্ষে চিকিৎসক ও রোগী বসার ভাল ও মন্দ অবস্থান

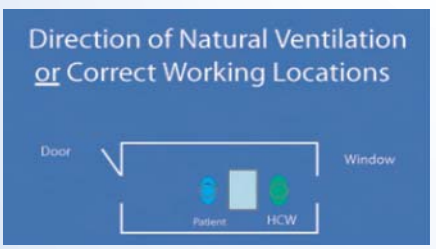

চিত্র ৪.১ : একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগী দেখার কক্ষ

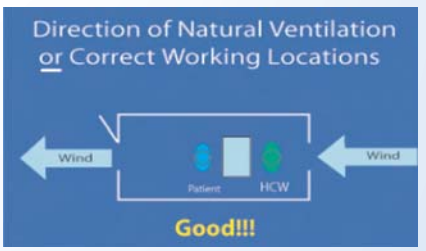

চিত্র ৪.২ : একটি ভাল বসার আয়োজনের নমুনা চিত্র

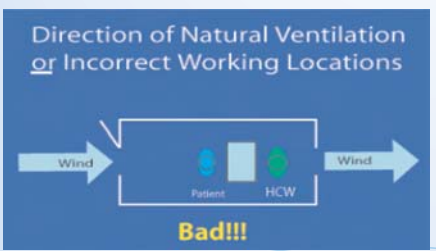

চিত্র ৪.৩ : একটি খারাপ বসার আয়োজনের নমুনা চিত্র

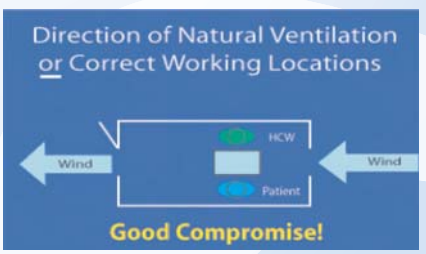

চিত্র ৪.৪ : একটি ভাল সমঝোতামূলক বসার নমুনা চিত্র

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি

যক্ষ্মার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বাস্থ্য কর্মীদের ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মারোগী অথবা সন্দেহজনক ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মারোগীর সেবা দান কালে "পারটিকুলেট মাস্ক" (এন-৯৫/N-95) ব্যবহার করতে হবে।

"পারটিকুলেট মাস্ক" ব্যবহারের সাধারণ তথ্যাবলী

- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ স্থান সমূহ-যেমনঃ ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মারোগীর কক্ষ, বাসগৃহ, যক্ষ্মা জীবাণু কালচার এবং ডিএসটি পরীক্ষাগার ইত্যাদিতে কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের চিহ্নিত করণ।
- স্বাস্থ্য কর্মীদের বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও "পারটিকুলেট মাস্ক" এর ফিট টেস্ট (উপযুক্ততা পরীক্ষা) করা।
- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ স্থান সমূহে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার পূর্বক কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের "পারটিকুলেট মাস্ক" ব্যবহারের জন্য সতর্কীকরণ।
- পরবর্তী ব্যবহারের জন্য মাস্কটি পরিস্কার, শুষ্ক এবং নিরাপদ স্থানে রাখা (১-২ সপ্তাহ)

আবদ্ধ জনবহুল স্থাপনায় যক্ষ্মার ঝুঁকি

একই সাথে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতে হয়, গাদাগাদি করে থাকতে হয় এমন পরিবেশ, কম বায়ু চলাচলকারী আবদ্ধ স্থান, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা বঞ্চিত এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চেয়েও যক্ষ্মার সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। এসকল স্থানের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল- জেলখানা, মেস, ক্যাম্প, শরনার্থী শিবির, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, স্কুল, হোস্টেল ইত্যাদি। তাই এসব স্থানে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের মতই সমপরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এসব ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্রুত যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসার আওতায় আনা এবং হাঁচি কাশি সহ যক্ষ্মা ছড়ানোর আচরণগুলির ইতিবাচক পরিবর্তন জোরদার করতে হবে।

বাসস্থান

যেহেতু একই বাসস্থানে বসবাসকারী সদস্যদের মধ্যে যক্ষ্মা সংক্রমণ, যক্ষ্মা রোগ ও ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা হওয়ার ঝুঁকি বেশি, তাই সমাজে যক্ষ্মা বিস্তার রোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যক্ষ্মা রোগী বাড়িতে বা হাসপাতালে যেখানেই চিকিৎসা গ্রহণ করুক না কেন, যথোপযুক্ত চিকিৎসায় বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক কমে যায়।

যেহেতু চিকিৎসা শুরু করার পরও ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা সাধারণ যক্ষ্মার চেয়েও অপেক্ষাকৃত বেশিদিন ধরে সংক্রামক থাকে, সেহেতু এসব রোগীদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ বেশিদিন ধরে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে থাকে।

যক্ষ্মারোগ সনাক্তকরণের পূর্বে ও পরে বাসস্থানে যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের উপায়

- স্বাস্থ্য কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সমাজে যক্ষ্মা সংক্রমণ রোধ সংক্রান্ত আচরণ পরিবর্তনের বার্তা প্রচার, স্বাস্থ্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ করে হাঁচি কাশির ইতিবাচক আচরণ সম্পর্কে তথ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ (IEC) উপকরণ সরবরাহ করা।
- যক্ষ্মা রোগীর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সন্দেহজনক যক্ষ্মা রোগী খুঁজে বের করা ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।
- সকল ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীদের বাড়ি পরিদর্শনপূর্বক সঠিক বায়ু চলাচল, হাঁচি কাশির ইতিবাচক আচরণবিধি সম্পর্কে সকলকে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান।
- রোগীর নিকট সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিবর্গের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদান।
- এইচআইভি-ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা (DR TB/HIV co-infection) রোগীদের সংস্পর্শে থাকা সদস্যদের মধ্যে এইচআইভি ও যক্ষা পরীক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

হাঁচি-কাশির আচরণবিধি

হাঁচি কাশির আচরণবিধি সম্বলিত বার্তা এবং তথ্য শিক্ষা যোগাযোগ (IEC) উপকরণ, যেমন লিফলেট, স্টিকার, পোস্টার ইত্যাদিতে নিম্ন লিখিত তথ্য সমূহ থাকা বাঞ্ছনীয় ঃ

- হাঁচি-কাশির সময় হাতের উল্টা পিঠ, বাহু, টিস্যু পেপার, কাপড়ের টুকরা, রুমাল, শাড়ির আঁচল, ওড়না অথবা মাস্ক ইত্যাদি দিয়ে নাক মুখ ঢাকতে হবে।
- হাঁচি-কাশির সময় অন্যদের থেকে মুখ সরিয়ে নিতে হবে।
- কফ থুথু যেখানে সেখানে না ফেলে কাপড়, টিস্যু অথবা ঢাকনা যুক্ত পাত্রে ফেলার পর সেগুলো নিকটস্থ ডাস্টবিনে ফেলতে হবে।
- হাঁচি কাশির পর ব্যবহৃত হাত সাবান-পানি অথবা উপযুক্ত জীবাণুনাশক দিয়ে ধুতে হবে।

১

ডান হাতের তালুতে মাস্কটি রেখে মাস্ক এর নাকের অংশটি হাতের আঙ্গুলের ডগায় রাখতে হবে, যাতে করে মাস্কের মাথা বন্ধনি গুলি সহজে হাতের পাশ দিয়ে নিচে ঝুলতে পারে।

২

এখন মাস্কটি থুতনির নিচে লাগাতে হবে যাতে করে নাকের অংশটি নাকের উপরের শক্ত অংশে বসে।

৩

এরপর নিচের মাথা বন্ধনিটি টেনে মাথার উপর দিয়ে নিয়ে মাথার পিছনে কানের নিচে গলায় বসাতে হবে।

৪

এবার মাস্কটির উপরের মাথা বন্ধনিটি টেনে মাথার উপর দিয়ে নিয়ে মাথার পিছনে দুই কানের উপর বসাতে হবে

৫

তারপর মাস্ক এর নাকের ধাতব অংশটি দুই আঙ্গুল দিয়ে চেপে নাকের উপরের শক্ত অংশে এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে করে বায়ু চলাচল করতে না পারে।

৬

ফিট টেস্ট ঃ- মাস্কটি ঠিক ভাবে মুখে লেগেছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য দুই হাত দিয়ে মাস্কটি ধরে জোরে ফুঁ দিয়ে দেখতে হবে যে, মাস্কটির পাশ দিয়ে কোন বাতাস বের হয় কি না। যদি নাকের পাশ দিয়ে বাতাস বের হয় তবে ৫ম ধাপটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে। আর যদি মাস্কটির দু পাশ দিয়ে বাতাশ বের হয় তবে মাথা বন্ধনিগুলি পুনরায় সঠিক ভাবে বসাতে হবে। মাস্কটি সঠিক ভাবে মুখে ফিট না হওয়া পর্যন্ত ধাপ গুলো পূনরাবৃত্তি করতে হবে।

চিত্র ৫ : N95 বা FFP2 মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা

চিত্র ৫ : ভাল এবং মন্দ অভ্যাসের উদাহরণ (বাংলাদেশ)

ক) ভাল : প্রাকৃতিক আলো বাতাস পূর্ণ সিঁড়িপথ

খ) মন্দ : সংস্কার পরবর্তী বদ্ধ জানালা

গ) ভাল : খোলামেলা অপেক্ষার স্থান

ঘ) মন্দ : রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অচল জানালা

ঙ) ভাল : মাস্ক পরিহিত ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগী

ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য ও স্বাস্থ্যকর্মীদের করণীয় সমূহ

- ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীর বাসগৃহে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত করতে হবে।
- ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীকে দিনের অধিকাংশ সময় ঘরের বাইরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসপূর্ণ স্থানে থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অসংক্রামক না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলকারী কক্ষে একাকী ঘুমাতে এবং যানবাহন ও জনবহুল এলাকায় যতদূর সম্ভব স্বল্প সময় অবস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ।
- জীবাণুযুক্ত ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীদের আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাতের সময় রোগীকে মাস্ক পরিধানে উদ্বুদ্ধকরণ।
- ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীকে বাড়িতে চিকিৎসা প্রদান কালে স্বাস্থ্য কর্মী এবং সেবাদানকারীকে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- এ ধরনের যক্ষ্মা রোগীর বাড়িতে পাঁচ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের রোগীর সংস্পর্শে আসতে দেয়া উচিত হবেনা এবং এ সমস্ত বাচ্চাদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ আছে কি না তা নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।
- এইচআইভি তে আক্রান্ত রোগীর বাড়ির শিশুসহ অন্যান্য সদস্যদের ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীর কাছাকাছি না আসার জন্য পরামর্শ প্রদান করতে হবে।
- সামর্থ্য থাকলে ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীর বাড়িটি তার ব্যবহারের উপযুক্ত করতে হবে; যেমন- আলাদা শয়ন কক্ষ, বাইরে অবস্থান ঘর, জানালাটা বড় করে দেয়া অথবা বিপরীত দেয়ালে নতুন জানালা তৈরি করা, দেয়ালে ভেন্টিলেটর তৈরী করা, বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ১০টি পদক্ষেপ

১। পরামর্শমূলক কার্যক্রমে রোগী ও সমাজকে অন্তর্ভূক্ত করণ।
২। স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত থাকা।
৩। হাঁচি কাশির ইতিবাচক আচরণবিধি সম্পর্কে জনগণকে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান।
৪। সন্দেহজনক রোগীদের মধ্যে যক্ষ্মা দ্রুত সনাক্তকরণ এবং পৃথকী করণ।
৫। সনাক্তকৃত রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা প্রদান।
৬। যক্ষ্মা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ।
৭। ঔষধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীর সেবা প্রদানকালে বিশেষ মাস্ক (এন-৯৫) পরিধান করা।
৮। স্বাস্থ্য কর্মী ও বাড়ি পরিদর্শনকারীদের যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ এবং যক্ষ্মা প্রতিরোধে করনীয় সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা।
৯। সবসময় বায়ু চলাচলের জন্য যেন ঘরের জানালা খোলা থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।
১০। সন্দেহজনক যক্ষ্মা রোগী ও কফে জীবাণুযুক্ত যক্ষ্মা রোগীকে অন্যান্য রোগী বিশেষ করে এইচআইভি রোগীদের থেকে আলাদা করা।

নির্দেশিকাটি তৈরিতে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন

১. ডাঃ মোঃ আশেক হোসেন
পরিচালক এমবিডিসি ও লাইন ডাইরেক্টর টিবি/লেপ্রসি, এনটিপি, ডিজিএইচএস

২. ডাঃ মোঃ নূরুজ্জামান হক
উপ-পরিচালক এমবিডিসি ও প্রোগ্রাম ম্যানাজার টিবি, এনটিপি, ডিজিএইচএস

৩. ডাঃ মোঃ আব্দুল হামিদ
ডিপিএম প্রকিউরমেন্ট এন্ড লজিস্টিক্স, এনটিপি, ডিজিএইচএস

৪. ডাঃ কে. এম. আলমগীর
ডিপিএম ট্রেনিং, এনটিপি, ডিজিএইচএস

৫. ডাঃ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান আকন্দ
সহকারী অধ্যাপক (রেসপিরেটরী মেডিসিন), এনআইডিসিএইচ, মহাখালী, ঢাকা

৬. ডাঃ মোছাঃ হালিমা খাতুন
জুনিয়র কনসালটেন্ট, বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, কুষ্টিয়া

৭. ডাঃ কাওসারী জাহান
মেডিকেল অফিসার, এনটিপি, ডিজিএইচএস

৮. ডাঃ মোঃ মনজুর রহমান
মেডিকেল অফিসার, এনটিপি, ডিজিএইচএস

৯. ডাঃ মোঃ মকিম আলী বিশ্বাস
মেডিকেল অফিসার, এনটিপি, ডিজিএইচএস

১০. ডাঃ চৌধুরী শামিমা সুলতানা
জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

১১. ডাঃ মোঃ মজিবর রহমান
ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কনসালটেন্ট, এনটিপি, ডিজিএইচএস

১২. ডাঃ ভিকারুন্নেছা বেগম
ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, ডব্লিউএইচও

১৩. ডাঃ সাবেরা সুলতানা
ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, ডব্লিউএইচও

১৪. ডাঃ এম. এইচ. এম. মাহমুদুল হাসান
ইনফেকশন কন্ট্রোল এক্সপার্ট, এনটিপি, ডিজিএইচএস

১৫. ডাঃ মোঃ আবু সায়েম
বিভাগীয় টিবি এক্সপার্ট, রাজশাহী বিভাগ, এনটিপি, ডিজিএইচএস

১৬. ডাঃ শাকিল আহমেদ
পিপিএম এক্সপার্ট, এনটিপি, ডিজিএইচএস

১৭. ডাঃ নরেন্দ্র নাথ দেউরী
এইচ. আর. এক্সপার্ট, এনটিপি, ডিজিএইচএস

১৮. ডাঃ মোঃ কামরুল আমিন
টিবি/এইচআইভি এক্সপার্ট, এনটিপি, ডিজিএইচএস

১৯. ডাঃ ফাহমিদা খানম
টিবি ল্যাব এক্সপার্ট, এনটিপি, ডিজিএইচএস

২০. ডাঃ মোঃ শহীদ আনোয়ার
বিভাগীয় টিবি এক্সপার্ট, সিলেট, এনটিপি, ডিজিএইচএস

২১. ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন
সিনিয়র টেকনিক্যাল এডভাইজার, টিবি কেয়ার-২, ইউআরসি

২২. ডাঃ মোঃ লুৎফর রহমান
প্রোগ্রাম কনসালটেন্ট জিএফএটিএম, ইউপিএইচসিএসডিপি

২৩. ডাঃ কাজী আল মামুন সিদ্দিকী
সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিষ্ট, ব্র্যাক

২৪. সরদার তানজির হোসেন
মাইক্রোবায়োলজিস্ট, টিবি ল্যাব ও আইসি কনসালটেন্ট, ব্র্যাক

২৫. প্রিয়জিৎ কুমার নন্দী
এসিএসএম কো-অর্ডিনেটর, ডেমিয়েন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ।

যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধে হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় কিছু নিয়ম মেনে চলুন

হাঁচি, কাশির সময় হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন অথবা মুখ একপাশে ঘুরিয়ে নিন

হাঁচি, কাশি দেওয়ার সময় রুমাল কিংবা টিস্যু দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন

হাঁচি, কাশির পর রুমাল ধুয়ে ফেলুন অথবা ব্যবহৃত টিস্যু নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলুন

হাঁচি, কাশি দেওয়ার পর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন